রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' (১৩১৮) নাটকখানি সাংকেতিক নাটকের ধারায় এক অন্যতম সংযোজন। নাটকে কিছু বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সংযোজনে নাটকের কায়া গড়ে উঠেছে। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র একটি ক্ষুদ্র বালক যার ঐটুকু শরীরে একসঙ্গে বাত পিত্ত শ্লেষ্মা প্রভৃতি রোগ প্রকটিত হয়েছে। রোগাক্রান্ত, শীর্ণকায় ক্ষুদ্র বালক অমল মাধবদত্তের পোষ্যপুত্র। ছোটবেলা থেকে বেচারার মা নেই, বাবাও সেদিন মারা গেছে। অনাথ শিশুটিকে গ্রাম্য সম্পর্কের পিসীমা অর্থাৎ নিঃসন্তান মাধব দত্তের স্ত্রী তাদের কাছে নিয়ে এসেছে। নাটকের মূলদ্বন্দ্ব বিষয়নিষ্ঠ হিসেবী মাধবদত্তের বিত্তবাসনা বনাম ক্ষুদ্র শিশুর অপার বিশ্বরহস্যের লীলা আস্বাদন। অমলের জন্যই বিত্তবাসনালিপ্সু মাধব দত্তের কিছু পরিবর্তন এসেছে। ঠাকুরদাকে সে শুনিয়েছে—

> 'আগে টাকা রোজগার করতুম, সে কেবল একটা নেশার মতো ছিল—না করে কোনোমতে থাকতে পারতুম না। কিন্তু এখন যা টাকা করেছি, সবই ঐ ছেলে পাবে জেনে উপার্জনে ভারি একটা আনন্দ পাচ্ছি।'

মৃত্যুপথযাত্রী অকপট শিশু অমল তার শিশুহৃদয়ের সারল্যে বিশ্বদেবতার অপার সৃষ্টিরহস্যময় লীলাজগতে নিজেকে একাত্ম করতে চায়। তাই সহজ-সাধারণ জীবন প্রণালীর প্রতি অবিচ্ছেদ্য আকর্ষণে সে বারবার ঘরের বাধা কাটাতে চায়। গাছ-ঝরনা-পাখি-নদী-পাহাড় বিশ্বদেবতার সৃষ্ট অপার সৌন্দর্যময় রহস্যের দ্যোতনা। 'ডাকঘর' নাটকটি যখন রচিত হয়েছিল তখন ছিল কবির খেয়া-গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য পর্ব। স্বাভাবিকভাবেই কবিহৃদয় বিশ্বদেবতার সৃষ্টিসৌন্দর্যের আধ্যাত্মিক লীলায় মগ্ন। আলোচ্য নাটকের অমল যেন সেই লীলার প্রকাশক। এই লীলারস

উপভোগের আকর্ষণে ঘরের বাঁধন ছেঁড়ার তীব্র ঐকান্তিকতায় বিশ্বদেবতার ডাক আসতে ডাকঘরের প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' গল্পের তারাপদর হৃদয়তন্ত্রেও ধ্বনিত হয়েছে সুদূরের আহ্বান। নিত্যচঞ্চল, বন্ধনভিরু, নিত্যপলাতক, হরিণশিশু তারাপদ প্রকৃতির আনন্দযজ্ঞে রবাহূত হয়ে তার লীলারস আস্বাদন করতো। কিন্তু অমলকে গৃহ-খাঁচার পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো সুদূরের পানে ডানা মেলে উড়বার স্বপ্ন দেখে যেতে হয়েছে। শিশুহৃদয় অকলুষ, নির্মল বলেই রসময় বিশ্বদেবতা তার মধ্যে এমন কল্পনাশক্তি দিয়েছেন যার ভেলায় ভেসে সে পৌঁছে যেতে পারে কাঙ্ক্ষিত জগতে। অমল জানলার পাশে বসে ঐ দূরের পাহাড়ের নীচে ঝরণার জলে ছাতু ভিজিয়ে খাবার স্বপ্ন দেখে। এমনই তার কল্পনাজাত বর্ণনা যেন জাতিস্মর সে। এই প্রকৃতিসান্নিধ্যে সুখে বিচরণ করার বাধা তার ব্যধি নয়। বরং অবিলম্বে সেই রহস্যদোত্যনায় পৌঁছে দেবার মাধ্যম, যেখানে অমলের সদানন্দময় চিত্ত সর্বদা রসাস্বাদন করে চলেছে। কবিরাজের বারণ, পিসেমশাইয়ের শাসন তার সচলমান চিত্ততরীর বিরুদ্ধে মূঢ় এক প্রতিরোধ। অমলের শিশুমনের সারল্যে একে একে তার বন্ধু হয়েছে সকলে। মোড়ল ব্যতীত নাটকের আর সকলেই হয়ে উঠেছে অমলপ্রাণ। —

শিলাইদহে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথের একটা nervous breakdown হয়েছিল। দিনরাত মরবার কথা এবং মরবার ইচ্ছা তাকে তাড়না করেছে। কিন্তু 'যস্য ছায়ামৃতং তস্য মৃত্যু ঃ' (মৃত্যু ও যাঁর অমৃত ও তাঁরি ছায়া)। এই ঔপনিষদিক উপলব্ধি 'ডাকঘর' নাটকে ছড়িয়ে রয়েছে। নাটকের শেষে অমল সকল জাগতিক বন্ধনকে ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছিল মৃত্যুতে, এবং বিশ্বরহস্যের অপার মহিমা উপলব্ধির, পরিপূর্ণ রহস্য-সৌন্দর্যের সীমায় পৌঁছানোর বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। 'রাজা' নাটকের ঠাকুরদা 'ডাকঘর'-এ ও ছেলে খেপাবার মন্ত্র নিয়ে আবির্ভূত। কবিপ্রাণ, হৃদয়বান মানুষ ঠাকুরদা অমলের সুদূর বিচরণকারী মনের সৌন্দর্যপিপাসার জোগানদাতা। সে অমলকে কাল্পনিক ক্রৌঞ্চদ্বীপের নীল পাহাড়, নদী, সমুদ্র ও পাখিদের গল্প শোনায়। গল্পকথকের ভূমিকায় বিচিত্র দেশের গল্প শুনিয়ে রোগগ্রস্থ, ক্ষুদ্র, কৌতূহলী শিশুমনের পিপাসা নিবারণ করে। আলোচ্য নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রের নামকরণের মধ্যে নাট্যকারের সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। অমলের মন ধবলের মতো। কোনো কলুষতা, গ্লানি, বিপন্নতা নেই তার। এমন সহজ, সরল, সাধাসিধা বালকটির উপাধি 'গুপ্ত' ও ব্যঞ্জনাময়। চারদেওয়ালের কঠিন পিঞ্জরে বদ্ধ তার মন বারবার উড়ে যেতে চায় অনেক দূরে। তার শরীরের বাধা দেওয়াল আর জানালা কিন্তু মনের বাধা মাধব দত্ত ও কবিরাজ। আপন বাসনাকে জয় করার সক্ষম পায়ের শক্তি তার নেই বলেই পিসেমশাই ও

কবিরাজের শত বারণকে উপেক্ষা করে সে তার কল্পনাবিলাসী ভাবুক মনকে সৃষ্টিদেবতার লীলানিকেতনে নিয়ে যায় কল্পনার স্রোতে ভাসিয়ে। নাটকে আকস্মিক ভাবে ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্যঞ্জনায় তার মর্মার্থ অনুধাবনযোগ্য। অসময়ে অমলের ঘুম পায়, মাঝে মাঝে প্রহরীর ঘন্টা ঢং ঢং ঢং করে বাজে। এ সব কিছুই নাটকে সংকেতধর্মী বিষয়। অমলের রাজার চিঠির পথ চেয়ে বসে থাকার ইঙ্গিতটিও অর্থবহ। রাজার চিঠি পাবার স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের যোগ থাকার কথা নয় বলেই মোড়ল তা নিয়ে পরিহাস করে। বাস্তবিক নাট্যকার এখানে যে ইঙ্গিতের প্রেষণা দিতে চান তার যথার্থ পাঠক ঠাকুরদা। তাই মোড়লের পরিহাসনির্ভর অক্ষরশূন্য চিঠির অর্থ সে বোঝে এবং বলে—

> 'হ্যাঁ, আমি খেপেছি। তাই আজ এই সাদা কাগজে অক্ষর দেখতে পাচ্ছি! রাজা লিখছেন তিনি স্বয়ং অমলকে দেখতে আসছেন, তিনি তাঁর রাজকবিরাজকেও সঙ্গে করে আনবেন।'

নির্বোধ মোড়ল বোঝেনা এ চিঠি সকলের জন্যই বরাদ্দ আছে। রাজার ডাক-হরকরা এসে একদিন সকলকে দিয়ে যাবেন। কেবল যার পাওয়ার ভাগ্য যখন হবে। এই আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধ হলে মোড়লই পাঠকের পরিহাসের যোগ্য হবেন। আর রাজা ও তার রাজপুরোহিত নিজে আসেন তার কাছেই যার মধ্যে নিজের সৃষ্ট আনন্দরূপের প্রকাশ যথাযথ।

মোড়লের সাদা কাগজটি আরেকদিক থেকে অর্থব্যঞ্জক। তা অমলের জীবনতরী অসীম শূন্যতার পথে চালিত হবার ডাক। এই ডাক দিয়েছেন রাজা। চরাচরে যা কিছু প্রকাশিত, প্রকটিত সবকিছুই বিশ্বনিয়ন্তার আনন্দরূপের প্রকাশ—'আনন্দ রূপমমৃতং যদ্বিভাতি'। সত্যের এই আনন্দরূপ, অমৃতরূপকে যারা অন্তরে উপলব্ধি করে তাদের জন্য রাজা স্বয়ং আসেন। অমলের জীবনেও তার আবির্ভাব তাই অনিবার্য সত্য। শিশু হলেও নাটকে বারবার অমলের সংলাপে ফুটে উঠেছে গভীর তত্ত্বব্যঞ্জকতা—কেউ বলে 'সময় বয়ে যাচ্ছে', কেউ বলে 'সময় হয় নি'। অমলের বিশ্বাস প্রহরী ঘন্টা বাজিয়ে দিলেই সময় হয়ে যাবে। 'সময় কেবলই চলে যাচ্ছে' যে দেশে সেই দেশে অমল যেতে চাইলে প্রহরী বলে—'সে দেশে সবাইকে যেতে হবে বাবা'। এই গভীর অর্থময় উক্তি যেন প্রহরীর নয়। যেন তা সেই কাঙ্ক্ষিত রাজার উপদেশ। কর্মব্যস্ত জীবনের মানুষ কর্মের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতেই যাচিত সময়ে উপনীত হয়। তাই পরপারের ডাক আসার সময় না হলেই 'সময় হয় নি' মনে হয়। ক্রমে অমলের রোগ জটিল হতে শুরু হলে তার রাজার চিঠি পাবার উৎকণ্ঠাও বাড়তে থাকে। ঠাকুরদা তাকে আশ্বস্ত করে—'শুনেছি তো তাঁর চিঠি রওনা হয়ে বেরিয়েছে। সে চিঠি এখন পথে আছে।' চরম সময় উপস্থিত হলে অমল ঠাকুরদাকে বলে—

'আমি যেন অনেক দূরের কথাও শুনতে পাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে, আমার মা বাবা যেন শিয়রের কাছে কথা কচ্ছেন'।

এই 'দূরের কথা' আসলে পার্থিব গণ্ডীর বাইরের ডাক। আর মৃত মাতা-পিতার উপস্থিতি তাকে যেন স্নেহের হাতছানি দিয়ে তাদের কোলে টেনে নিয়ে যাবার হাতছানি। বিষয়ী মাধবদত্ত অমলের আশ্রয়দাতা। বিষয়বাসনা, ভোগপিপাসায় তার মন এতই নিবিষ্ট যে অমলের, ঠাকুরদার, রাজকবিরাজ ও রাজার অর্থব্যঞ্জক গভীর দ্যোতনাময় সংলাপের কোনো অর্থই সে বোঝে না। কেবল উপার্জিত টাকা উত্তরাধিকারীর হাতে সাবধানে সমর্পণ করে যাবার চিন্তায় অমলের চিকিৎসায় তার এত কড়াকড়ি, নির্দেশ। রাজার অগমনের বার্তা কানে যেতেই নির্লজ্জ লোভীর মতো সে বলে—

'বাবা, রাজা তোমাকে ভালোবাসেন, তিনি স্বয়ং আজ আসছেন—তাঁর কাছে আজ কিছু প্রার্থনা কোরো। আমাদের অবস্থা তো ভালো নয়। জান তো সব।'

স্বাভাবিক ভাবেই মাধবদত্তের জন্য পাঠকের হৃদয়ে করুণা জাগে। বিশ্বরাজার কাছে বিত্ত চেয়ে সন্তুষ্ট হতে চায় সে। মহৎ চাওয়া 'মুক্তি' আদায় করে নেওয়া নয়, চাই সম্পদ। কিন্তু অমল ঠিক করে রেখেছে সে চাইবে—তাঁর ডাকঘরের হরকরা হতে। রাজদূত, রাজকবিরাজদের সামনে একটু একটু করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে অমল। মাধবদত্তের আশ্রয় খণ্ডিত হবার পর তার জন্য যে বরাদ্দ রয়েছে এক মহৎ আশ্রয়ের কোল। সে কোল বিশ্ববিধাতার নিভৃত আশ্রয়ের কোল। অমলের জন্য সুধার ফুল আজ এসেছে। রাজকবিরাজকে সুধা অনুরোধ করে অমলকে জানিয়ে দিতে যে—'সুধা তোমাকে ভোলে নি'। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। ব্যঞ্জনাময় এই প্রেমসংলাপে নাটক সমাপ্ত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকখানি বিশ্বাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার মিলন সূচিত হবার ব্যঞ্জনাময় অনুভূতির নাটক। নাটকে সেই বিশ্বাত্মা হলেন রাজা। আর মানবাত্মা ছোট্ট শিশু অমল। শিশুর অন্তরাত্মা অনাবিল ও অবিকৃত সত্তায় অসীম আনন্দে মিলিত হবার সহজাত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। অপার রহস্যময়, প্রেমময়ের চিরন্তন আহ্বানে সাড়া দিতে সুতীব্র বাসনা থাকে তার হৃদয়ে। চিরপথিক শিশুর বিশ্বপথিক মন যে সারল্যে সেখানে উপনীত হতে পারে তা অন্যের দ্বারা অসম্ভব। অসীম অনন্তের মধ্যে মানবাত্মার যে পিপাসা, সুদূরের উৎকণ্ঠা মিশ্রিত থাকে তার স্বরূপ শিশুমনে যত সহজে উপলব্ধ হতে পারে অন্যের ক্ষেত্রে তা তত সহজ নয় বলে নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র অমল নামক শিশুটি। প্রকৃতির রহস্য-সৌন্দর্যের মধ্যে ভগবানের অনাদি রূপের প্রকাশ। শিশুমন সেই

অনাদি-অসীম রূপকে আপন বলে ভাবতে জানে। সাংকেতিক নাটক হিসাবে নাটকের পাত্র-পাত্রীদের অনেকের সংলাপ গভীর তত্ত্বব্যঞ্জক ও সংকেতধর্মী। পাশাপাশি নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্ন প্রতীকের সংকেত। যেমন—

১। ডাকঘর

২। ডাকহরকরা

৩। ঘণ্টা

৪। চিঠি

এইসব সংকেত রবীন্দ্রমননের তিনটি ধারার প্রকাশ—১। বিশ্বসৌন্দর্যানুভূতি ২। ব্যক্তিগত নিজস্ব বাল্যস্মৃতি, ৩। মহারাজার সঙ্গে মিলনের অভিলাষ। আসলে এই সমগ্র বিশ্বটিই অনাদি রাজার এক ডাকঘর। বালকের জ্ঞানপরিধিতে বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিস্থাপনে নাটকে তা বালকের চোখের সামনে বসাতে হয়েছে। বিশ্বদেবতা তার আপনবার্তা এই ডাকঘরের মাধ্যমেই সকলকে পৌঁছে দেন। সেই বার্তার বাহক হলেন ডাকহরকরা, যারা বার্তার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত অসীমের সৌন্দর্য ও আনন্দরূপকে সকলের কাছে প্রচার করে বেড়ায়। অমলের পিপাসা একদিন সেও ঐ ডাকহরকরা হবে। আর রাজার চিঠি হল বিশ্বেশ্বরের ডাক। অনন্ত রহস্যের সৌন্দর্যগীত। বিশ্বেশ্বর সময় হলেই তার সঙ্গে তার জীবাত্মার মিলন সাধনের ডাক দেন। সে চিঠিতে বয়ান থাকে না। সাদা অক্ষরে যে বয়ান লেখা আছে মূঢ় তার অর্থ না বুঝলেও ঠাকুরদা বুঝেছিল। অমলের সময় এসে গেছে সেই অপার রহস্যলোকে প্রবেশ করে চিরন্তন সৌন্দর্যের অমৃত ভোগ করার। রাজা এখানে সেই বিশ্বনিয়ন্তা মহারাজ বিশ্বেশ্বর। নাটকে ঘণ্টার ব্যবহারও সাংকেতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে অর্থময়। অমল বারবার সেই সংকেত ঘণ্টা শোনে আর ব্যাকুল হয় চিরন্তন মিলনপথে ধাবিত হতে। নাটকের শেষে সুধার ফুল নিয়ে আসা নাটকের আঙ্গিকেও বিশেষ অর্থবহ। ফুল হল প্রেমের প্রতীক। স্বয়ং বিশ্বদেবতা যেন তার চিরন্তন প্রেমের মঙ্গলময় দিকটি ফুটিয়ে গেলেন জগৎবাসীর জন্য। সংকেতের বিশেষণে এভাবে সাংকেতিক নাটক 'ডাকঘর' হয়েছে কবির আধ্যাত্ম চেতনার উপলব্ধি।